অভ্যন্তরীণ জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি ও টেকসই পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জ; প্রয়োজন সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কাঠামো শক্তিশালীকরণ

১. প্রারম্ভিকা:

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। ভৌগোলিক অবস্থান, ঘনবসতি ও দারিদ্র্য এই ঝুঁকিকে আরও গভীর করেছে। বিশেষ করে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ যেমন- খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী ও কক্সবাজার ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদী ও উপকূলীয় ভাঙনের কারণে ক্রমাগত বসবাসের জন্য ঝুঁকপূর্ণ হয়ে উঠছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরবাড়ি, জমি ও জীবিকা হারিয়ে নিজ এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি শুধু একটি পরিবেশগত সমস্যা নয়; এটি একটি গভীর মানবিক, সামাজিক ও উন্নয়নগত সংকট। বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী শহরের বস্তি বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে, যেখানে তাদের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনসংক্রান্ত আন্তসরকারি প্যানেলের (আইপিসিসি) ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আধা মিটার (০.৪৮) থেকে ২ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। যে কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৯টি জেলা পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে শুধু সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণেই এসব অঞ্চলের ২ কোটি ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে।

২. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতির বৈশ্বিক সঙ্কট

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তুচ্যুতি একটি বৈশ্বিক সঙ্কট, যা শুধু পরিবেশগত নয়, বরং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রাতেও গভীর প্রভাব ফেলছে। আইপিসিসির গবেষণার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত 'গ্রাউন্ডসওয়েলল: প্রিপেয়ারিং ফর ইন্টারনাল ক্লাইমেট মাইগ্রেশন' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০৫০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাবে পৃথিবীব্যাপী ১৪ কোটি ৪৩ লাখ মানুষকে অভ্যন্তরীন বাস্তচ্যুতীর জীবন বেছে নিতে হবে। এরমধ্যে আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলের ৮ কোটি ৬০ লাখ মানুষ, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার ৪ কোটি এবং লাতিন আমেরিকার ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ ভবিষ্যতে এই বাস্তচ্যুতির শিকার হবে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীন বাস্তুচ্যুতির সংকট

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ এক ভবিষ্যতের দিকে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এখানে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, ভূমিধস এবং খড়ার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতার কারনে অভ্যন্তীরন বাস্তচ্যুত মানুষের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। ধারনা করা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারনে বর্তমানে যে পরিমাণ বাস্তচ্যুতির ঘটনা ঘটছে আসন্ন বছরগুলোতে তা আরো প্রকট আকার ধারন করবে। বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বাস্তচ্যুত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্রের তথ্য বলছে, আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে প্রতি ৪৫ জনে একজন এবং বাংলাদেশে প্রতি ৭জনে ১জন জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাস্তচ্যুত হবে।

অতিসাম্প্রতিক আইওএমের গণনার তথ্য অনুযায়ী, দুর্যোগের কারণে বর্তমানে ৪৯ লাখ ৫৫ হাজার ৫২৭ জন মানুষ দেশের ভেতরে বাস্তচ্যুত অবস্থায় রয়েছে, এর দুই-তৃতীয়াংশ বাস্তচ্যুত মানুষ (৬৩ শতাংশ) ২০২০ সালের এপ্রিলের আগেই বাস্তচ্যুত হয়েছে, যা দীর্ঘস্থায়ী ও অমীমাংসিত বাস্তচ্যুতিরই প্রতিফলন, এবং এক-চতুর্থাংশ (২৫ শতাংশ) ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে বাস্তচ্যুত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে বেশি বাস্তচ্যুত মানুষ রয়েছে, এ সংখ্যা ১২ লাখ ১ হাজার। এরপর ঢাকা বিভাগে ৭ লাখ ৯০ হাজার লাখ এবং রাজশাহী বিভাগে ৬ লাখ ৬০ হাজার বাস্তচ্যুত মানুষ রয়েছে। মোট বাস্তচ্যুত মানুষের এক-চতুর্থাংশই রয়েছে চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, ভোলা ও নোয়াখালী এই চার জেলায়। অধিকাংশ বাস্তচ্যুত মানুষ (৮৫ শতাংশ) গ্রামীণ ইউনিয়ন এলাকায় বসবাস করে।

৪.অনিশ্চয়তায় ১.৫ ডিগ্রী লৈক্ষ্যমাত্রা; ঝুঁকিতে বাংলাদেশ সহ দ্বীপ রাষ্টগুলো

বিজ্ঞানীরা বরাবরই সতর্ক করছেন,জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো ছাড়া তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়, কপ-৩০'র ব্যর্থতায় সেই আশঙ্কা আরও বেড়েছে, পৃথিবী এগোচ্ছে ৩ ডিগ্রি উষ্ণতার দিকে। এই পরিস্থিতি নিম্নভূমি বাংলাদেশসহ দ্বীপরাষ্ট্রগুলো রয়েছে অস্তিত্বের হুমকিতে। বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের তিন-চতুর্থাংশের বেশি আসে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে। কপ-৩০-এর জীবাশ্ম জ্বালানির রোডম্যাপ বাদ দেয়া ও ব্যবহার কমানো বাধ্যতামূলক না করে স্বেচ্ছার ভিত্তিতে করার আহ্বান মূলত বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের মূল কারনকে এড়িয়ে যাওয়া,যার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা হ্রাসের বাস্তবসম্মত কোন পথই খোলা থাকলো না। চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা না থাকায় দূষণকারী দেশগুলো কোন প্রকার চাপ অনুভব করবেনা ফলে কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রচেষ্টা ব্যার্থ হবে ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার লক্ষ্য অর্জন কঠিন হয়ে উঠবে, বিদ্যুৎ, পরিবহন ও শিল্পে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। এতে ১.৫ ডিগ্রি'র লক্ষ্যমাত্রা গতি হারাবে ফলে ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ২.৬-৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি আরো বেড়ে গেলো।

৫. অভ্যান্তরীন বাস্তুচ্যুতির প্রধানতম কারনসমূহ

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘন-ঘন ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং নদী ভাঙনসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়েছে এবং ধারনা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে আরো বাড়বে।

ক. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

গবেষণা বলছে, দেশের উপকূলে সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রতি বছর গড়ে ৪ দশমিক ৫৮ মিলিমিটার করে বাড়ছে। এটি বৈশ্বিক গড় (৩ দশমিক ৭ মিলিমিটার) থেকে অনেক বেশি। এই বৃদ্ধির হার চট্টগ্রামে ৪ দশমিক ৭৩ মিলিমিটার, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ, পশ্চিমের সুন্দরবনে এই হার ৩ দশমিক ৬৬ মিলিমিটার এবং কেন্দ্রীয় মেঘনা মোহনা সমভূমিতে ২ দশমিক ৪ মিলিমিটার। দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১১ দশমিক ৫ মিটার উঁচুতে অবস্থিত, এটা অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা। প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রীর মধ্যে ধরে রাখতে জীবাশ্ম জ্বালানি'র ব্যবহার থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না হওয়ায় বিজ্ঞানীদের ধারনানুযায়ীয় বিশ্ব এখন ৩ ডিগ্রি উষ্ণতার দিকে ধাবিত যা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের মতো বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।বাংলাদেশের উপকূলীয় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা (সমুদ্রপৃষ্ঠ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে) **দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ কেন্দ্রীয় উপকূলাঞ্চল**

সাতক্ষীরা	পটুয়াখালী	ভোলা	বাগেরহাট	বরিশাল
খুলনা	ঝালকাঠি	পাথরঘাটা	পিরোজপুর	বরগুনা
এসকল অঞ্চলের অনেক জায়গার উচ্চতা প্রায় ২-৫ মিটার মাত্র এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খুব কম।[Assessment of Sea Level Rise on Bangladesh COAST]				

গবেষণায় দেখা গেছে এই সকল অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা ১০ মিটারের নিচে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় খুব নিচু হওয়ায় ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি।

খ. নদী ভাঙ্গন:

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশীপ সেন্টার (বিডিপিসি) কর্তৃক জরিপে বলা হয়েছে, দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫১টি জেলায় নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে ৫ লাখ ৫০ হাজার ২শ' ৭০ একর জমি। জরিপে আরও বলা হয়, নদী ভাঙনে উদ্বাস্তু, গৃহহীন ও ভাসমান মানুষের সংখ্যা প্রতি বছর ২ লাখ ৫০ হাজার করে বাড়ছে। এ বিপুলসংখ্যক মানুষ বাঁধ, রাস্তা, পরিত্যক্ত জমি প্রভৃতি স্থানে ভাসমান এবং মানবেতার জীবন-যাপন করছে। এদের মধ্যে বৃহদাংশ হচ্ছে

শহরমুখী। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বিশ্বব্যাংক, ইউএসএআইডির সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রতিবছর নদী ভাঙনের মাধ্যমে যে বিশাল ভূ-ভাগ প্রকৃতি আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তার মাত্র ১০ ভাগ সে ফেরত দেয় নতুন চর জাগিয়ে। গবেষণা সংস্থা বাংলাদেশ সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) এর সমীক্ষা অনুযায়ী, ১৯৭৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশের এক হাজার ৭০০ বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকা নদীতে বিলীন হয়েছে। এতে প্রায় ১৭ লাখ ১৫ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

গ. লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ হুমকিতে খাদ্য নিরাপত্তা

দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোর প্রায় ৫৩ শতাংশ অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা রয়েছে। লবণাক্ততার প্রভাব কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানবস্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন খাতে দৃশ্যমান। উৎপাদন কমে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর কৃষিজমিতে লবণের স্বাভাবিক মাত্রা ধরা হয় ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি অব স্যালিনিটি (ডিএস)। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় অনেক অঞ্চলের কৃষিজমিতে ২৫ ডিএস মাত্রায় লবণের উপস্থিতিও পাওয়া যাচ্ছে। স্লুইচ-গেইটগুলো নির্মান করা হয়েছে অপরিকল্পিত, রক্ষনা বেক্ষনের অভাবে অধিকাংশই নষ্ট, বিস্তৃর্ণ অঞ্চল জলবাদ্ধ হয়ে পড়ছে, আবাদি জমি সীমিত হয়ে পড়ছে, কৃষি ভিত্তিক জীবিকা সংকুচিত হচ্ছে, খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।আইপিসিসসি এর দেয়া পূর্বানুমন বলছে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ৩০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

ঘ. ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধি

এডিবির মতে, বাংলাদেশে প্রতিটি বড় ঘূর্ণিঝড়ের কারনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫০ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা। এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আমাদের সময় লাগে ১০ বছরের মতো। আগে বাংলাদেশে ১০০ বছর পর পর একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঘটনা ঘটত। এখন এ সময় কমে গেছে, প্রতি ৩ বছরের মধ্যে এখন বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে। আর ঘন ঘন দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ও সংখ্যা দুটোই বাড়ছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট থেকে বাস্তুচ্যুতি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এই অঞ্চল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ঠাঁই নিচ্ছে রাজধানী ঢাকা ও বন্দরনগর চট্টগ্রামে।

৬. দুর্বল উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো [বেড়িবাঁধ] বাস্তুচ্যুতির ঝুঁকি

দুর্বল উপকূলীয় সুরক্ষা বেড়িবাঁধের কারণে বিভিন্ন সময়ের ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভেঙে গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হচ্ছে, এছাড়াও নিম্নচাপ এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমার জোয়ারে বাঁধ উপচিয়ে লোকালয়ে পানি ঢুকছে, ফলে উপকূলীয় জেলা বিশেষ করে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরিশাল, বরগুনা, ভোলা ও কক্সবাজার অঞ্চলের কয়েক মিলিয়ন মানুষ অত্যান্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং এই সব অঞ্চলগুলোতে দিন দিন আশংকাজনকহারে বাস্তুচ্যুতির ঘটনা বেড়েই চলেছে। স্থানীয়দের মতে অনেক ক্ষেত্রেই, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঠিক তদারকির অভাব এবং ঠিকাদারদের নিম্নমানের কাজের কারণে বাঁধগুলো টেকসই রূপ পাচ্ছেনা। বিশেষজ্ঞদের মতে, লোকালয়ে লবণ পানি ঢুকছে, এই লবণাক্ততার কারনে ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিও বাড়ছে, সঠিকভাবে বাঁধ তৈরিও মেরামত না করার কারণে এই বাঁধগুলো এখন সাধারণ মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাগর ও নদী বেষ্টিত দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের বেড়িবাধের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এর মধ্যে ২ হাজার ২শ কিলোমিটার বাঁধই অরক্ষিত ও চরম মাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ।

৭. নগরগুলিতে ক্রমাগত বাড়ছে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা:

বিশ্বব্যাংকের হিসাব জানাচ্ছে, বাংলাদেশে এখন প্রতিবছর ৪ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছেন স্থায়ীভাবে এই সংখ্যা প্রতিদিন প্রায় ২ হাজারের মতো তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ হচ্ছে জলবায়ু বাস্তচ্যুত। যারা শহরে এসে বস্তিতে বসতি গড়ে তুলেছেন তাদের বেশিরভাগ মানুষ এসেছেন প্রাকৃতিক দূর্যোগের প্রতিকূলতার সাথে টিকতে না পেরে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, পাহাড়ধ্বস, নদী ভাঙনের মতো দূর্যোগগুলো প্রতিনিয়ত বাড়ছে। কৃষি জমি ভেসে যাচ্ছে, ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে। মানুষ কর্মহারা-গৃহহারা হয়ে পড়ছে। ফলে, জীবন বদলের আশা নিয়ে তারা পাড়ি জমাচ্ছে শহরগুলোতে। তাছাড়া প্রতিবছর নদী ভাঙন এলাকা থেকে ২০-৩০ শতাংশ বাস্তুহারা জনগোষ্ঠী নিকটবর্তী শহরে এবং বড় শহরে অভিগমন করে থাকে। ঢাকা শহরের বিপুল সংখ্যক বস্তিবাসীর প্রায় ২৫ শতাংশ নদী ভাঙনজনিত কারণে রাজধানী শহরে ছুটে এসেছে (তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রতিবেদন) চট্টগ্রামে 'বাস্তুহারা কলোনি'র মত অনেক জায়গাতে জলবায়ু শরণার্থীরা বসবাস করছে। জায়গাগুলির বেশিরভাগই ইয়াবা-মাদক ব্যবসায়ীদের দখলে রয়েছে। উদ্বাস্তুদের অনেকে শহরে কাজ না পেয়ে মাদক ব্যবসায়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এসমস্ত জায়গায় প্রায় উচ্ছেদ অভিযান হয়, যার ফলে হতদরিদ্র হাজার হাজার মানুষ আবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে।

৮. আর্থ-সামাজিক সংকট

বাস্তুচ্যুতির শিকার ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুতির কারণে তাদের অধিকার ও দাবি আদায়ে মারাত্মক অসুবিধায় পড়েন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা বিপর্যয়ের পরে বহু রকমের মানবাধিকার সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা হুমকির মুখে পড়ে। তাঁরা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হন; সহায়তা, সেবা, অপরিহার্য সামগ্রী এবং অনুদান পাওয়ার বেলায় বৈষম্যের কবলে পড়েন। শিশু, এতিম, গর্ভবতী মা, প্রবীণ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষেরা অবহেলা, নিগ্রহ ও শোষণের শিকার হন; বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং টিকে থাকার জন্য পরিবারের উপর নির্ভরশীলেরা অনেক সময় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যক্তিগত দলিলপত্র হারিয়ে যায় বা ধ্বংস হয়; সেগুলি নতুন করে তৈরি করাও কঠিন, কেননা এ ধরনের জনগোষ্ঠীর জন্য জন্মনিবন্ধনের ব্যবস্থা, আইন প্রয়োগের বন্দোবস্ত এবং সুষ্ঠু ও কার্যকর বিচার ব্যবস্থার বিশেষ সুযোগ পাওয়ার উপায় খুবই সীমিত। কাজ ও জীবিকার সুযোগের অসমতা, জোরপূর্বক স্থানান্তর; দুর্যোগে বাস্তুচ্যুত মানুষদের অনিরাপদ ও অনৈচ্ছিক প্রত্যাবর্তন বা পুনর্বাসন; সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও জমিপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগের চিত্র স্পষ্ট। এছারাও পরিকল্পিত পুনর্বাসন করা না গেলে সামাজিক ঝুঁকির আশংকাও বাড়তে পারে যেমন- তারা মাদক চোরাচালান, চুরি, ডাকাতির মত অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের পরিমাণ বাড়ছে, সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়তে পারে। ফলে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তচ্যুত হবে বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের সুরক্ষা ও অধিকার কীভাবে নিশ্চিত করা যায়, তা নিয়ে সরকারের কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

৯. জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগ অপর্যাপ্ত

সরকার জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও, জলবায়ুজনিত বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলায় বিদ্যমান উদ্যোগসমূহ এখনো পর্যাপ্ত, সমন্বিত ও টেকসই নয়। বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ও ঝুঁকির তুলনায় বর্তমান নীতি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে স্পষ্ট ব্যবধান রয়ে গেছে।

ক. স্বল্পমেয়াদি ও দুর্যোগকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি: সরকারি উদ্যোগের বড় অংশই দুর্যোগ-পরবর্তী ত্রাণ ও অস্থায়ী পুনর্বাসনে সীমাবদ্ধ। দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন, জীবিকাভিত্তিক অভিযোজন, সামাজিক সংহতি ও অন্তর্ভুক্তি এই বিষয়গুলো পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায় না। ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষ বারবার ঝুঁকিতে পড়ে।

খ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত: গবেষনা বলছে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর ৮০% গ্রামীন জনপদের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি কাজ করার দায়িত্ব মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর (ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) ওপর পড়ে। কিন্তু তাদের পর্যাপ্ত বাজেট নেই, কারিগরি দক্ষতার সীমাবদ্ধতা প্রকট, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা সীমিত, ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছেনা।

গ. পুনর্বাসনে জীবিকা ও সামাজিক সুরক্ষার দুর্বলতা: সরকারি পুনর্বাসন প্রকল্পগুলোতে অনেক সময় আবাসন নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, টেকসই

জীবিকা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো বিষয়গুলো উপেক্ষিত থাকে। এর ফলে পুনর্বাসন দীর্ঘস্থায়ী হয় না এবং মানুষ আবার স্থানচ্যুত হয়।

ঘ. অর্থায়ন ও জবাবদিহির ঘাটতি: যদিও সরকার আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল ও দেশীয় বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ করে, কিন্তু স্থানীয় চাহিদার তুলনায় অর্থায়ন মোটেই পর্যাপ্ত নয়, এবং স্চচ্ছতা ও জবাবদিহিতা দুর্বল হওয়ার কারনে কাংখিত ফল অর্জিত হয় না।

১০. বাস্তুচ্যুতির টেকসই পুনর্বাসনে প্রয়োজন সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ (সুপারিশসমূহ):

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বাস্তচ্যুতি একটি বহুমাত্রিক ও দীর্ঘমেয়াদি সংকট। এই সংকট কেবল মানুষের আবাসন হারানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবিকা, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানবিক মর্যাদার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে।নানা দুর্যোগে প্রতি বছর বাংলাদেশে বাস্তুচ্যুত হচ্ছে গড়ে ১২ লাখ ১৫ হাজার মানুষ। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ুর প্রভাবে বাস্তুচ্যুতির এই ঘটনা প্রায় ৮০ ভাগ কমানো সম্ভব। এর জন্য এখন থেকেই দরকার সঠিক নীতি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কৌশল, এ ছাড়া বাস্তুচ্যুতির এই সমস্যা দিন দিন আরো বিপজ্জনক আকার ধারণ করবে।

"জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলায় কেবল জরুরি সহায়তা বা বিচ্ছিন্ন পুনর্বাসন যথেষ্ট নয় প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে শক্তিশালী, সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, যা বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন, টেকসই পুনর্বাসন ও ভবিষ্যৎ জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা নিশ্চিত করবে"

ক. জলবায়ু বাস্তচ্যুতি একটি স্থানীয় বাস্তবতাভিত্তিক সমস্যা

জলবায়ুজনিত বাস্তচ্যুতির ধরন, মাত্রা ও প্রভাব অঞ্চলভেদে ভিন্ন। উপকূল, নদীভাঙনপ্রবণ এলাকা বা হাওর অঞ্চলের চাহিদা এক নয়। কেন্দ্রনির্ভর বা একক সমাধান এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তবতা যথাযথভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হবেনা। স্থানীয় সরকার ও কমিউনিটির নেতৃত্বে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা বাস্তবসম্মত ও কার্যকর সমাধান নিশ্চিত করতে পারে।

খ. খন্ডিত/বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ টেকসই পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে ব্যর্থ

বর্তমানে পুনর্বাসন উদ্যোগগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে খন্ডিত বা বিচ্ছিন্ন, স্বল্পমেয়াদি ও প্রকল্পনির্ভর। আবাসন দেওয়া হলেও জীবিকা, সামাজিক সংহতি ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি বিবেচনায় নেওয়া হয় না। ফলে মানুষ বারবার বাস্তচ্যুত হয়। সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা আবাসন, জীবিকা, সামাজিক সেবা ও অভিযোজনকে একীভূত করে টেকসই পুনর্বাসনের পথ তৈরি করা জরুরী।

গ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও সক্ষমতা অপরিহার্য

বাস্তচ্যুত জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে কাছাকাছি কাজ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাদের কারিগরি দক্ষতা, অর্থায়ন ও সমন্বয় ক্ষমতা সীমিত।স্থানীয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে পারলে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বাড়বে এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই হবে।

ঘ. কমিউনিটির অংশগ্রহণ ছাড়া পুনর্বাসন টেকসই হবে না

বাস্তচ্যুত মানুষ যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহন না করে, তাহলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা তাদের প্রয়োজন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। কমিউনিটি-ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক স্থানীয় ব্যবস্থাপনা সামাজিক সংহতি তৈরি করবে, নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করবে, আত্মনির্ভরতা বাড়াবে।

ঙ. ভবিষ্যৎ জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি

জলবায়ু বাস্তচ্যুতি একটি চলমান প্রক্রিয়া। বিশেষজ্ঞদের পূর্বানুমান অনুযায়ী ভবিষ্যতে এই ঝুঁকি আরও বাড়বে। শুধু পুনর্বাসন নয়, ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা গড়ে তোলা জরুরী।সমন্বিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা-স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যবহার করতে হবে, ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতি জোরদার করতে হবে যা বারংবার বাস্তচ্যুতির ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করবে।

চ. অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র-২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্যোগ ও অর্থায়ন জরুরী:

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১৯ সালে অভ্যন্তরীণ বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র-২০২১ খসড়া প্রতিবেদনটি নতুন তথ্য সংযোজনের মাধ্যমের হালনাগাদ করে যা ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে একটি সংশোধিত খসড়া আকারে প্রকাশ করা হয়। কৌশলপত্রের আওতায় বাস্তুচ্যুতিকে ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত করে বাস্তুচ্যুতি প্রতিরোধের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে। কৌশলপত্র অনুযায়ী বাস্তুচ্যুতির তিনটি পর্যায় হল-প্রাক-বাস্তুচ্যুতি; বাস্তুচ্যুতিকালীন অবস্থা; বাস্তুচ্যুতি-পরবর্তী সময়। কৌশলপত্রটির দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প হলো দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা জনগোষ্ঠীকে পরিবর্তনশীল জলবায়ু ও দুর্যোগের প্রতি সহিষ্ণু বা অভিঘাত-সক্ষম করে তোলা। সরকার জাতীয় কৌশলপত্র-২০২১ প্রণয়ন করলেও বাস্তবায়নের অগ্রগতি চোখে পাড়েনি, কৌশলপত্রে জাতীয় বাজেটের অর্থায়ন থেকে বাস্তুচ্যুতি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দের বিষয়গুলো উল্ল্যেখ করা হলেও অগ্রগতি যথেষ্ট অস্পষ্ট। আভ্যান্তরীন জলবায়ু বাস্তচ্যুতির মতো একটি জাতীয় সমস্যা মোকাবেলায় এবং তাদের অধিকারভিত্তিক সুরক্ষার বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার বিনিয়োগ খাত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া প্রয়োজন।

ছ. জলবায়ু অভিঘাত মোকাবেলায় প্রয়োজন টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ:

প্রায় ৩৯ মিলিয়ন লোক উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করে যাদের ৮০-৯০% হচ্ছে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে দীর্ঘস্থায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা বিগত কয়েক দশকে ক্রমাগত হারে বাড়ছে। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে প্রতিবছর জিডিপি'র প্রায় ২% ক্ষতি হয় শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, সেই হিসেব বছরে ৬৫ থেকে ৭০ হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় এবং এই ক্ষতি পুনরুদ্ধারে সরকারকে ১% জিডিপির জন্য আরো ৫% অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হচ্ছে। ফলে অতিরিক্ত ব্যায় বাড়ছে এবং সরকারের পরিকল্পিত টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি মারাত্তকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

যখন দুর্যোগ হয় তাৎক্ষনিক ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে সরকার একটা জরুরী বরাদ্দ দিয়ে থাকে। বাঁধ নির্মান এবং মেরামতের মধ্যে প্রকৌশলগত ভিন্নতা রয়েছে। এ জন্য আমরা অনেক সময় বাঁধ মেরামতকেই বাঁধ নির্মান বলে ধরে নেই এবং বাজেটেও বলা হয়ে থাকে বাঁধের জন্য বরাদ্দ। উপকূল এলাকায় প্রায় ৭০-৮০% [সরকারের তথ্য মতে] বাঁধই জলোচ্ছাস ও জোয়ারের পানি ঠেকানোর অনুপোযোগী। কারন এসকল বাঁধের উচ্চতা পূর্ব থেকেই অনেক কম এবং মানসম্মত মেরামত ও বব্যস্থাপনা নিয়মিত নয়। যে কারনে জলবায়ু পরিবতনের নেতিবাচক প্রভাব [সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস-জোয়ার বৃদ্ধি] মোকাবেলায় মানসম্মত উচ্চতার টেকসই বেড়ীবাঁধ প্রয়োজন।

১১. পরিশেষে

বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সদিচ্ছা ও কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ থাকলেও, জলবায়ুজনিত বাস্তচ্যুতি মোকাবেলায় বিদ্যমান উদ্যোগগুলো এখনও অপর্যাপ্ত, খন্ডিত/বিচ্ছিন্ন ও স্বল্পমেয়াদি। এই সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন- জলবায়ুজনিত বাস্তচ্যুতিকে জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কমিউনিটি-ভিত্তিক টেকসই পুনর্বাসন ও জীবিকাভিত্তিক অভিযোজন কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা, নারী, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন কাঠামো ও বহুপক্ষীয় সমন্বয় জোরদার করা এবং তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা জোরদার করা।

কোস্ট ফাউন্ডেশন
ঠিকানা: মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড নং-০২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।